কত্তা বনাম গিন্নি

সুশীলকুমার সিংহ

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট,কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

গোড়ার কথা

প্রথমেই বলে রাখি — 'কত্তা বনাম গিন্নি' বইটিতে যেসব কোন্দলে কত্তা ও কলহ-পরায়ণা গিন্নিদের কথা আছে তা কিন্তু এক্কেবারেই কল্পলোকের গল্প-কথা নয়। তবে এগুলি শহর বা নগর থেকে নয়—বাঁকুড়া জেলার, যাকে বলে একেবারে অজ পাড়া-গাঁ থেকে সংগ্রহ করা। এসব অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা বলেই অনেক 'গেঁয়ো-কথা' যাকে আমরা 'বাঁক্‌ড়ি বুলি' বলি ঢুকে আছে এ গল্পগুলিতে। মাঝেমধ্যে অবশ্য বন্ধনীর মধ্যে সেসবের অর্থ দেওয়া আছে, তবুও শহুরে কানে এগুলি লাগবে কেমন জানি না।

যাই হোক গেঁয়ো বাঁকুড়ারই ছেলে আমি। ছেলেবেলা থেকেই এসব কোন্দলে বুড়ো-বুড়িদের কলহ-কচায়ন প্রায়ই পড়ত চোখে আমার। দেখতামও মজা করে। সেই মজার লোভে আসতাম ঠাকুমার কাছে। জিজ্ঞাসা করতাম তাকে আমার স্বর্গত ঠাকুরদা'র সঙ্গে তাঁর কীরকম খিটিমিটি হত-সেসব কথা। ঠাক্‌মা গলা তপড়া মুখে বলতেন, "সেসব হাসি দুঃখের কথা তোকে আর কী বলব ভাই!" একই সুরে উত্তর পেতাম আমার মামাবাড়ি মেটালায় এসে জিজ্ঞেস করতাম যখন আমি আমার "নানা" অর্থাৎ দাদু-ভাইকে নানী অর্থাৎ দিদি-ভাই এর কথা, "ওসব হাসি-দুঃখের কথা কী আর বলব রে!"

ওইসব হাসি-দুঃখের কথাই—যা আমি শুনেছিলাম ইঁচড়-পাকা আমি ঠাক্‌মা দাদু ভাইদের মুখে, এবং অকাল-কুষ্মাণ্ড আমি যা আমি দেখেছিলাম সেই বাল্যকালে আমাদের তথা আমাদের পাশের গাঁয়ের ঘর-বাখুলের পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে, তাই গেঁথে দিলাম এই পুস্তকে। এ গল্পগুলির মধ্যে কতটা হাসির আর কতটা দুঃখের কথা আছে তা আপনারাই বিচার করবেন।

বুড়ো জীবনটাকে মানুষের একটা সত্যিই বিচিত্র পর্যায় বলে আমার মনে হয়। সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন সে দাঁড়ায় এ অধ্যায়ে এসে তখন জীবন তার শুকিয়ে আসে, শরীর হয় কর্ম-বিমুখ— শিথিল, স্নায়ু হয় দুর্বল। তাই মনে তেজ নিয়ে সেসব অভিজ্ঞতা ধরে চলব বললেও সে রকম চলার শক্তি আর তার থাকে না। তাই সেসব অভিজ্ঞতাগুলোকে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ঢেলে দিতে চায়। কিন্তু তারা সেসব মানে না। গিন্নিকে বলবে কী—বুড়ো কাকে কখনও কি রামনাম করে? তার ভাজা-পোড়া জীবনের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার জন্য উল্টো বুড়োকেই করে সে দায়ী। দায়ী করে কত্তাটিকে তার—তার জীবনের কোথায় কোন সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ হয়নি, হয়নি তার কোন আশাপূরণ, কোন আকাঙ্ক্ষা অসমাপ্ত—এসবের জন্য। ফলে কত্তা-গিন্নির মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই লেগেই থাকে। থাকলেও লেগে এ বয়েসে যেমন বুড়ি ছাড়া বুড়োর গতি নেই তেমনি বুড়ো ছাড়া বুড়িরও গতি নেই। তাই ঝগড়ার পর মিলন, মিলনের পর কলহ চক্রবৎই চলতে থাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এভাবে চলতে চলতে কে যে

কখন চলে যায়, সরে যায় কেউ তারা তা জানে না। তবে ছেলে-ছোকরাদের চোখে কত্তা বনাম গিন্নিদের এসব ঠসাঠসি দেখতে লাগে ভালো, উপভোগ করতেও লাগে মজা।

তবে ভালোই লাগুক আর মজাই লাগুক—জীবনের এই পর্যায়টাকে তাদেরও তো একদিন আসতে হবে। অর্থাৎ কুন্দনন্দিনীরা একদিন হবে দাঁত-ফোকলা বুড়ি। ফুলকো লুচির মতো গালওয়ালারা একদিন হবে গাল-তপড়া বুড়ো। সেই বুড়ো চামড়া-ঝুলো মুখ না হওয়া পর্যন্ত এসব বুড়ো-বুড়িদের দুঃখ-কষ্ট কেউ তারা বুঝবে না। আমি বলছি, সেই বোঝার বয়সাটা না আসা পর্যন্ত সবাই একটু হাসুন। প্রাণ খুলে হাসুন, মন খুলে হাসুন, হৃদয় খুলে হাসুন। শুধু কিশোর-কিশোরী ছেলেমেয়েরাই নয়, বুড়ো-বুড়ি কত্তা-গিন্নিরাও হাসুন। জীবনে যা করে এসেছেন—এসেছেন। "শেষ ভালো যার, সব ভালো তার"—এই প্রত্যয় নিয়ে হাসুন। হাসতে হাসতে গাম্ভীর্য-ভরা মন হাল্কা হোক, গোমড়া বদন সুন্দর হোক। ভাব-ভারিক্কি স্বভাব দূর হয়ে হোক হাসির চোটে সবার প্রকৃতি সহজ-সুন্দর। পবিত্র হোক অন্তর, সরল হোক হৃদয়, হাসির উচ্ছলতায় উজ্জ্বলতায় মন হোক শুদ্ধ মুক্ত পুতঃ ও পবিত্র। এই আশাতেই আমার এই একগণ্ডা একটি গল্পের ঝুলি অর্থাৎ পাঁচটি হাসির 'এ্যাটম বোমা' দিলাম তুলে সবার হাতে। ফেটে এগুলি সবাকার মন হাসি দুঃখে বিশেষ করে আনন্দে ভরে উঠলেই লেখা হবে আমার সার্থক। হবে পূর্ণ ইচ্ছা আমার। পূরবে আমার মনোরথ। এই আশাতেই রইলাম আমি।

শ্রীসুশীলকুমার সিংহ

সূচিপত্র

কত্তা বনাম গিন্নি □ ১১

খনা-কত্তা বনাম খনি-গিন্নি □ ৩৯

মদা-কত্তা বনাম মদি-গিন্নি □ ৯৬

ঘুম-গাদুনে কত্তা বনাম ঘুম-তাড়ুনে গিন্নি □ ১২৮

হ্-য-ব-র-ল কত্তা বনাম ব-দ-খ-চ গিন্নি □ ১৭০

কত্তা বনাম গিন্নি

গ্রামের ছেলে-ছোকরাদের মুখে প্রায়ই একটা গান শোনা যায়। বেশ মজার গলায়, টানা সুরে। গানটা হল—

"ওহো, যেমনি কত্তা ভুট্‌কা বদি,
তেমনি গিন্নি মট্‌কা পদি
ও-তাদের সম্পর্কটা জানবে যদি
আদায় কাঁচকলায় হে —
তেলে-বেগুনেও বলতে পারা যায়—
হায় রে, জলে তেলে যে মেশা বড়ো দায়।।
আহা, স্বভাব তাদের গণ্ডগোলে,
তাই থাকে তারা সাপে-নেউলে,
একবার দুম্‌-ধড়ক্কা লেগে গেলে—
তুলকালাম ধরায়—বাঁধায় হে
লাগলে ঝগড়া গ্রামকে মাতায়—
ওহো, বদিপদির পিরিত বুঝা দায়॥
তাক-তাক-তাক ধো গেজা গেজা
লাগ-লাগ-লাগ লেগে যা মজা
তাং কুড়কুড়ি, লাগ বুড়োবুড়ি, ফুটোফুটি হুড়োহুড়ি রে—
ও আমাদের সাধের বদি-পদিরে—
হায় আমাদের সাধের বদি-পদি ...।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সাধের বদি-পদি কে ? শুনুন তাহলে। ইনারা হলেন বৈদ্যনাথপুর গ্রামের ডাক-সাইটে কত্তা-গিন্নি। কত্তার পুরো নাম হল শ্রীমান বদ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তস্য পত্নী অর্থাৎ গিন্নির পুরো নামটি হল শ্রীমতি পদ্মাবতী দেবী। নাম দুটি তাদের বাপ-মা বেশ শ্রুতি-মধুর ও ভাব-ভারিক্কি গোছের রাখলে কী হবে—এমনি তাদের দুর্ভাগ্য যে বাড়ুজ্জে গিন্নিকে কেউ কোনোদিন আর ও নাম ধরে ডাকল না। দেবা-দেবীর সেই যে ছোটোবেলায় বদি-পদি ডাক-নাম চালু হয়ে গেছল সেই নামেই তারা পরিচিত হয়ে রইল এই অঞ্চলে বুড়ো বয়েস পর্যন্ত—বদি কত্তা, পদি গিন্নি।

কিন্তু ওসব কথা থাক। এখন কোন গুণটির জন্য তারা এ অঞ্চলে সমধিক পরিচিত সেটা নিয়েই অলোচনা করা যাক। বলতে অবশ্য লজ্জা নেই—সেটি হল তাদের দাম্পত্য কলহ। এ ব্যাপারে যেমনি কত্তা গাড়ল-বদি তেমনি গিন্নি দজ্জাল-পদি। কেউ কারো চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। মানে উনিশ-বিশ। আর সেই জন্যই তো গ্রামের ছেলে-ছোকরাদের মুখে বাঁধা ওই গানটা।

তবে শোনা যায় নাকি—বদি-পদির নামে নামে গণনায় রাজ-যোটক মিল হয়েছিল। সম-সপ্তক এই মিলের জন্যই হয়েছিল তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু তাহলে পতি-পত্নীর এই

আদায়-কাঁচকলায় সম্বন্ধটা কেন ? এই কেন-র উত্তর গাঁয়ের ধেঁড়ে-কৃষ্ট ও উঠতি ছোকরারা বা পাড়ার ফাজিল দামড়াও আমোদে বুড়ো-হাবড়ারা নানা কথা বলত। কেউ বলত, —যখন তাদের বিয়ের গাট-ছড়া বাঁধা হয়েছিল তখন নাকি একটু ঘুরঘুরে পোকা সকলের অলক্ষ্যে গেছল বাঁধা তাদের গাঁট-ছড়ার ভিতরে। কেউ বলত—ঘুরঘুরে পোকা নয় মাল-কাঁকড়া। এদের প্রকৃতি হল মারাত্মক গণ্ডগোলে। তাই গাঁট-ছড়ায় সেটা বাঁধা যাবার ফলে পতি-পত্নীর সম্পর্কটাও হয়ে গেছল অমনি মাল-কাঁকড়ার মতো গণ্ডগোলে। কেউ বলে—তা নয়। নিশ্চয়ই তাদের বিয়ের লেগ-দস্তুরের সময় কলাই-কড়কড়ে গেছল নড়ে। তাই তাদের বিয়ের পরই একে-ওকে কামড়ে খাবার প্রবৃত্তিটা গেছল বর্তে। নানা মুনির নানা কথা এখন না হয় ধামা-চাপা থাকে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, বিয়ের পর থেকে বদি-ছোকরা পদি-ছোকরি তাদের দাম্পত্য-কলহের ধারা সমান ভাবে বজায় রেখেও ঘর-সংসার করল কী করে ? কী করে হল তারা ছেলে-মেয়ের মা-বাপ ? অর্থাৎ পটলা-পুত্র ও টেঁপী-কন্যাকে তারা জন্ম দিল কী করে ? আরো আশ্চর্য—তাং কুড়কুড়ি, ফুটো-ফুটি হুড়োহুড়ি করেও এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত তারা পরস্পর টিকে রইল কোন শক্তিতে ? এসব অবশ্য গবেষণার বিষয়। কিন্তু যেহেতু আমরা গবেষক নই সেহেতু এসব ব্যাপারে মাথা কচকচি না করাই ভালো। অর্থাৎ কেন গাছ হল, কী করে ফল ধরল—এসব চিন্তা না করে আম খাওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ।

সত্যি, কত্তা বনাম গিন্নির ঝগড়া-ঝাটিটা ছিল দেখবার মতো। বুড়ো কত্তা বদি-বাবু বয়েসের ভারে এমনি হাড়-গোড় ভাঙা দ-এর মতো থাকত বটে, থাকত বটে পদি-বুড়িও গুঁড়ি-গুঁড়ি হয়ে কাস্তে কাটা ঙ-এর মতো। কিন্তু কলহ কচায়নে মেতে উঠলে তারা মনে হত এক অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি ভর করেছে তাদের। তখন বুড়োবুড়ির বয়েসের চাপ, মুরুব্বি হওয়ার বাধা কোথায় যেন যেত তলিয়ে। মনে হত যেন দু-মহাবল রণমদে উন্মত্ত। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল—তাদের এই হঠাৎ হঠাৎ দুম-ধড়ক্কা লেগে যাওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যেত না। আর মাতত যখন তারা পরস্পর কলহ-কচায়নে তখন তাদের লঘু-গুরু কোনো জ্ঞানও থাকত না। অর্থাৎ পতি যে পরম-গুরু, পত্নী যে সহ-ধর্মিনী, এ চিন্তা তাদের মন থেকে তখন কোথায় যেত উঠে। একজন অপরজনকে প্রতিপক্ষ শত্রু মনে করে হুকো-ছাতা, ডাবু-খুন্তি ; হেলে-বাড়ি , খাট-খুরো, হাতা-চাটু ইত্যাদি মারত ছুঁড়ে এলোপাথাড়ি। কানে-কপালে লেগে গেলে যে খুনোখুনি রক্তারক্তি হয়ে যেতে পারে উত্তেজনার মুহূর্তে সে-সব কোনো চিন্তাই থাকত না তাদের।

তা না থাকুক। বুড়ো-বুড়ির এই হুড়োহুড়িটা দেখতে লাগত কিন্তু বেশ ! গালের সঙ্গে বাখান, বাখানের সঙ্গে শাপান্ত ; শাপান্তের সঙ্গে বাপান্ত, বাপান্তের সঙ্গে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করা অশ্লীল, অশ্রাব্য কথা বর্ষণ হত মুষলধারে। তার সঙ্গে বদি-কত্তার ভুঁড়ি নাচানো ও পদি-গিন্নির কোমর দোলানো যুক্ত হয়ে চমৎকার একটা দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠত মুহূর্তের মধ্যে। এসব রণ-রঙ্গ আস্বাদন করার জন্য বুড়োবুড়ির প্রাচীর কোলে, চালার পাশে, ঘর-পিছনের গাছ-গাছালির উপর উঠে বসে থাকত গাঁয়ের ছেলে-ছোকরারা। লুকিয়ে, ঘুপটি মেরে। বুড়ো-বুড়ির হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেলেই অমনি গাঁয়ের মাঝ-কুলিতে ছুটে আসত সবাই। এসব বস্তু তো আর একা দেখে বেশ মৌজ পাওয়া যায় না। তাই আনন্দে তারা বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে উঠত সুর করে,—

"আয় ছুটে সব দেখবি যদি কত্তা-গিন্নির ঝগড়া—
মুখ ঝামটায় ফোগলি কেমন, দাঁত খিঁচকায় তপড়া।।"

সত্যি, ঝগড়া লাগলে ফোকলা-মুখী পদি-গিন্নির মুখ ঝামটানো রূপ যেমন হত দেখবার মতো—তেমনি তপড়া-মুখো বদি-কত্তার দাঁত খিঁচকানো চেহারা হত অপূর্ব ! এমন উপাদেয় বস্তু বোধ হয় দুনিয়ায় দুর্লভ। সুতরাং এসব জিনিস একার উপলব্ধি করা নয় ! একা দেখলে তেমন সুখ

পাওয়া যায় না। এসবের আসল রস আস্বাদন করতে হলে বন্ধু-বান্ধব সব জোট বেঁধে মিলে-মিশে, দল পুরু করে উপলব্ধি করতে হয়। তাই বদি-পদির কলহ-কাকলি যদি কারো কর্ণকুহরে কণামাত্র প্রবেশ করত তবে অমনি সেই লুকিয়ে থাকা মজা-লুটা দলটা ত্বরিত গতিতে মাঝ-কুলিতে ছিটকে বেরিয়ে এসে করত প্রচার,—

"আয় তোরা সব লেগে গেছে ভাই যুগল-বুড়োবুড়ি রে—
গাল তপড়া—দাঁত ফোগলির জমে গেছে হুড়োহুড়ি রে॥"

অমনি ছুটে আসত সব। গ্রামের চুনো-পুঁটি থেকে আরম্ভ করে রুই-কাতলা মানে নেড়া-নেড়ি বুড়ো-বুড়ি সবাই। বিদ্যুৎ বেগে। যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণে। ভরে যেত বদি-পদির আঙিনাটা। কারণ বুড়ো-বুড়ির এটাই তো হল রণক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র। একাই বুড়ো যেমন হত পাণ্ডব-পক্ষ, বুড়ি তেমনি হত কৌরব-পক্ষ। দু-পক্ষমুহূর্তে এমন মেতে উঠত রণ-মাতনে যে কে এল বা কারা এল, কখন এল বা কেন হল—সেসব দেখবার মতো তখন আর তাদের কোনো সময় থাকত না। দেখা তো দূরের কথা ওসব ভাববার মতোও তখন তাদের থাকত না অবকাশ, বা পেত না কোনো ফুরসত। ডাবু-খুন্তি, ঝাঁটা-জুতো ছুড়োছুড়ির সঙ্গে কামানের গোলার মতো পরস্পরের মুখ থেকে তখন বেরুত গালা-গালি বাখনা-বাখনি বান। "মুখপোড়ার" সঙ্গে "মুখপুড়ি", "ঘাটের মড়ার" সঙ্গে 'ভাগাড়ের কাড়া", "থুবড়োর" সঙ্গে "থুবড়ি" কাটান-জবাব, উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলো বর্ষণ হত মুষল ধারে। মটকা পদির হাত নাড়া ও ভুটকো বদির বুক চাপড়ান হত দেখবার মতো। হত সে এক হই-হই ব্যাপার—রই-রই কাণ্ড!

যতই তুঙ্গে উঠত ঝগড়া ততই উঠত জমে ছেলে-ছোকরাদের হাসি-মজা হই-হুল্লোড়! ঝগড়া-উদ্যত বুড়ো-বুড়িকে ঘিরে নখ বাজাত সবাই। নখ বাজালে নাকি গণ্ডগোল-ঝগড়ার বাড়-বাড়ন্ত হয়। বাড়-বাড়ন্তর মাত্রা আরো বেশি হয় যদি ঝগড়ার-ঠাকুর নারদ-মুনিকে করা হয় স্মরণ। সে স্মরণের একটা ছড়া আছে। সেই ছড়াটাই সুর করে আওড়ে সবাই নখ বাজিয়ে ঘুরত সেই রণোন্মত্ত বুড়ো যুগল দম্পতিকে। যেমন—

"নারদ গুণ গুণ লেগে যা
ইন্দুর মাটি খেয়ে যা।
ঝগড়ার দেবতা নারদ-মুনি,
ঢেঁকির পিঠে এস হে মহাগুণি
নখ বাজিয়ে তোমায় স্মরি
লাগুক দুমাদুম বুড়োবুড়ি
গণ্ডগোলের তুমি মহাগুরু
জমাও ঝগড়া পুরু পুরু
যাক লেগে ব্রহ্মা লেগে যাক
ভানুমতীর খেল জমে যাক
ধো-ধো ধা-ধা হুটোপুটি
হো-হো হা-হা মজা লুটি॥

সত্যি-সত্যিই জমে যেত মজা। এধার থেকে বুড়ো ছুড়ত বাণ,—"ছুঁচোমুখী হারামজাদি।" ওধার থেকে বুড়ির আসত পাল্টা বাণ,—"ছুঁচোমুখ্যা, হারামজাদা।"—"দূর বরারমুখী।"—"দূর ভোঁদড়মুখ্যা।"—"মোষ" ; —"কাড়া", —"গরু"—"ভেড়া", ইত্যাদি ইত্যাদি। মুখ-খিস্তির মাত্রা বাড়ত যতই, বাড়ত ততই বদি-কত্তার ভুঁড়ির নাচন ও পদি গিন্নির পাছার মাতন। তার সঙ্গে ঘাড় নাড়া, হাত নাড়া, পা ঝাড়া, নাক ঝাড়া তো ছিলই। তবে তাদের গণ্ডগোলের ডোজটা আর একটু বেড়ে গেলে হত সেটা একটা দর্শনীয় বস্তু। বুড়োর হুকোর সঙ্গে বুড়ির ডাবুর, কলকের সঙ্গে খুন্তির শুরু হয়ে যেত সে এক ফাটাফাটি কাণ্ড। কাণ্ডটা কাণ্ডজ্ঞানহীনের মাত্রায় গিয়ে দাঁড়াত যখন হুকো-খুন্তি-হাতা ছেড়ে বেপরোয়াভাবে হত শুরু থালা, বাসন, ঘটি, বাটি ছুড়ো-ছুড়ি। কোন্দল কলহ উঠত আরো চরমে যখন বদি-কত্তা রেগে গিয়ে ভাড়ার ঘর থেকে ছুঁড়ে ফেলতেন চালের হাঁড়ি। পদি-গিন্নি তার জবাবে তখন মেঝেয় আছড়ে ফেলতেন ভাতের হাঁড়ি।

বদি-কত্তা মুড়ির টিন তো পদি-গিন্নি তরকারির খোলা। একজন চিঁড়ের পাত্র তো অপরজন ফুটন্ত খোলার ডাল। সে এক বিচিকিচ্চি কাণ্ড ! মানে—

"যেমন পাত্র তেজালো বদি।
তেমনি পাত্রী ঝাঁঝালো পদি॥"

প্রজাপতি কী নির্বন্ধে যে বেঁধেছিলেন তাদের কে জানে। হয়তো তাদের বিয়েটা হয়েছিল কোনো ঝগড়াটে নক্ষত্রে কিংবা ঝঞ্ঝাটে তিথিতে। না হয় শুভদৃষ্টির সময় হয়তো হয়েছিল কোনো অশুভ-তিথির যোগ। আর তাও যদি না হয়—তবে বলতে হয় তাদের সৃষ্টিকর্তার দোষ। অর্থাৎ ব্রহ্মা যখন গড়ছিলেন তাদের তখন হয়তো তিনি গাঁজায় দিয়েছিলেন দম, কিংবা নেশায় হয়েছিলেন বুঁদ। তাই বদি-পদি গড়ার মাল-মশলায় এক দিতে হয়তো অন্য কিছু দিয়েছিলেন পুরে। কাল-বৈশাখীর গুঁড়ো কিংবা আশ্বিনের ঝড়ের টুকরো দিয়ে মাখ-চাখ করেছিলেন তাদের উপাদানটা। তার সঙ্গে হয়তো দিয়েছিলেন মিশিয়ে ছুঁচোর কিচ্‌কিচানি ও বানরের হুঁক-হুঁকোনি। কিংবা পেঁচার চোখ-টাটানি ও কাকের কলকলানি। মোট কথা পরস্পর বিপরীতধর্মী ধাতু দিয়ে গড়েছিলেন তিনি বদি-পদিকে। তা না হলে মাল দুটি তার এমন পরস্পর নেগেটিভ হবে কেন ?

তবে সে যাই হোক বদি-পদির পরস্পর এই নেগেটিভধর্মী প্রকৃতি গ্রামের ছেলে-বুড়ো, পুঁটি-বোয়ালদের কিন্তু পজেটিভ করে দিয়েছিল। দিয়েছিল মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে উপর-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নাম-পাড়ার ছেলেদের ও মাঝ-পাড়ার ছোকরাদের সঙ্গে উত্তর-পাড়ার ছোকরাদের। বদি-কৃষ্ণ পদি-রাধা যখন গণ্ডগোল-রূপ লীলায় মাততেন তখন বামুন-বাউরী, বাবু-ডোম, কুলীন-অকুলীন তারা-সোমে কোনো পার্থক্য থাকত না। ছোটো-বড়ো, উঁচু-নিচু সব জাতের ছেলে-মেয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে এ কলহ-রস তাদের পান করত।

"আহা মরি-মরি ! কী রূপমাধুরী !
মাতনে মেতেছে বদি-পদি বুড়ি
বগল বাজিয়ে বলি হরি-হরি
এ লীলা কহনে না যায় রে।
হের ভাই সবে, এস ত্বরা করি,
লজ্জা-ঘৃণা-ভয় সব পরিহরি,
দেখে যাও কেমন শঙ্কর-শঙ্করী
নাচে তাণ্ডবে হায়, হায় রে—
ঝাড়ু-হুঁকো হাতে ধায়॥"

সত্যি বলতে কী—বুড়োবুড়ির এই হুড়োহুড়িটা সমগ্র অঞ্চলটাতে একটা প্রবাদে পরিণত হয়ে গেছল। আরো সত্যি বললে বলতে হয়, গাঁয়ের উড়োন-চণ্ডী, বাউণ্ডুলে, মজা-লুটা ছেলে-ছোকরাদের বুড়োবুড়ির হুড়োহুড়ি-ঝগড়া দিনান্তে একবার অন্তত না দেখলে রাতে ঘুম হত না, পেটের ভাত হজম হত না। বদি-পদি এমনিতে না লাগলে ঝগড়া ঘরের আশে-পাশে তারা ঘুরঘুর করত। কী করে গণ্ডগোল লাগানো যায় তার জন্য করত তারা নানা ফন্দি-ফিকির, তুকতাক। তুক-তাক যেমন—আনত কেউ গণ্ডগোলে ফুল। লুকিয়ে গুঁজে দিত বুড়ো-বুড়ির ঘরের চালে। কেউ বা আনত ষাঁড়-লড়াই এর পায়ের ধুলো। ছড়িয়ে দিত বদি-পদির উঠোনে। আবার কেউ কেউ লুকিয়ে আনত গুরদা-লড়াই-এর মাটি। মানে যেখানে মোরগ লড়াই হয় সেখানকার, অর্থাৎ আখড়ার মাটি। গোপনে তা দিত ফেলে বুড়ো-বুড়ির মেঝেতে। এসব করলে নাকি গণ্ডগোল হয়। হয় গণ্ডগোল কারোর চালে কাকে-কাকে ঝগড়া-লাগা পালক যদি গুঁজে দেওয়া যায়। যায় যদি

চালে গুঁজে দেওয়া টসর-কাটা পাখির হাড় কিংবা লুকিয়ে অজান্তে যদি মুখোমুখি ছেড়ে দেওয়া যায় দুটো মাল-কাঁকড়া। –

এসব ছাড়া বাড়িতে ঝগড়া লাগাবার নাকি আরো তুকতাক আছে। যেমন কোনো ঝগড়াটে শুঁড়ির নাম বা গণ্ডগোলে বামনীর নাম গোপনে কারোর ঘরের ঈশান কোণের দেওয়ালে লিখে দেওয়া। লাউ-কুমড়োর শিকড় ঘরের চালে বেঁধে দেওয়া, তিঁত-পল্লার পাতা বা বীচি-বেগুনের কাঁটা বা যেসব গাছের ফল পাকলে আপনি ফেটে চারদিক বীচ ছড়ায় সেই সব ফলের বীচ যদি না কাকেও কারো ঘরের উঠোনে ফেলে দেওয়া যায় তাহলে নাকি ঝগড়া-গণ্ডগোল লাগে। তাই করত সব গায়ের ছেলে-ছোকরারা।

তবে এসব তুকতাকের চেয়ে চট-জলদি গণ্ডগোল লাগানোর মোক্ষম দাওয়াই হল বুড়ো-বুড়ির চালে মরা ব্যাঙ, বা পচা ইন্দুর কিংবা থেতলানো টিকটিকি বা গিরগিটি ছুড়ে দেওয়া। টাটকা টোটকা। চালে ওসব দেখলেই পালে পালে আসবে কাক। সেসবের অধিকার নিয়ে তারা পরস্পর করবে ঝগড়া-ঝাঁটি, লেগে যাবে ঝাপটা-ঝাপটি। আর অমনি পদি-গিন্নি চিৎকার করে উঠবে রান্না-ঘর থেকে তার বদি-কত্তাকে,—বলি এ মুখপোড়া, ঘাটের উপর বসে বসে হুকো টানছিস যে শুনতে পাচ্ছিস না।

"—কী শুনতে পাচ্ছি?"

—কী শুনতে পাচ্ছি? —বুড়োর কথাটাকে ভেংচি কেটে বলে উঠত বুড়ি—আমার মাথা আর মুণ্ডু নদী-ভরা। ঘরের চালে কাক কলকল করছে, আর তোর কানের ভুলংটাতে (ছিদ্রটাতে) তা ঢুকছেনা—ভুঁড়িন-ভুকো ?

"ভুঁড়িন-ভুকো" বললেই বুড়োর মেজাজ হয়ে যেত গরম। তাই রেগে অমনি সে হুঁকো-টানা বন্ধ করে উঠত বলে বেশ মরদানি গলায়,—"এ মুখপুড়ি, চালে বসে কাক কলকল করবে না-তো কি তোর গালে বসে কাক কলকল করবে ?

"আমার তুই গালে কাক বসালি মুখপোড়া !" চটে উঠত বুড়ি,—"তোর এত বড়ো বাড় (স্পর্ধা) ? ডাবুতে করে ছড়িয়ে তোর এক্ষুনি হুঁকো খাওয়াটার আমি শ্রাদ্ধ করে দেব—তা জানিস ?"

হুঁকো খাওয়া বন্ধ করা বুড়োর উপোস দিয়ে মরার সামিল। এ শাস্তি সব চেয়ে বড়ো শাস্তি তার। তাই ভয়ে বুড়ো কথাটা তার পাল্টাবার জন্য বাগিয়ে বলত, "দেখ টেপীর মা, আমি তোর গালের কথা বলিনি—কালের কথা বলছি। বলছি তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তোর। এখনও এত কুসংস্কার কেন ? চালে কাক ডাকবে, ডালে শকুন ডাকবে, খালে শেয়াল ডাকবে, পুকুর-ডোবায় ব্যাঙ ডাকবে—এটাই তো স্বাভাবিক। মাঠে ভেড়া বেবাঁবেই, পালে ছাগল মেঁমাবেই, গোঠে গরু গোঙাবেই। গোয়ালে কাড়া থাম্বলোনা, খোঁয়াড়ে বরা গঁক-গকানো, মোরগ ডাকা—হাঁস কেড়-কেড়ানো এসব হল প্রকৃতির নিয়ম। চালে কাক কলকল—

'তোর প্রকৃতির নিয়মের মুখে ঝাঁটা মারি মুখপোড়া !' ধমকে উঠল বুড়ি,—আমাকে তুই নিয়ম শিখাচ্ছিস ? তোর বাপ নদী-ভরা কী দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিল তোকে ? গোরু বিক্রি করে না ভেড়া চুরি করে ? গাধার মতো ভেবাচ্ছিস যে ? এ জ্ঞানটুকুও নেই তোর যে ঘরের চালে কাক কলকলালে গণ্ডগোল হয়। উঠ ভুস-কুমড়া। খেদাড় বলছি কাকগুলোকে। নইলে জামবাটি সুদ্ধ এই গরম মাড়টা ঢেলে দেব আমি তোর হেড়মো মুখটাতে।

একে ভুস-কুমড়ো, তার উপর আবার হেড়মো-মুখ বলা। শালির লঘু-গুরু কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই ? রেগে উঠল বুড়ো, "—কার সামনে কী বলছিস মুখপুড়ি তার কোনো মাথা-ছাতা নাই ! চালে কাক কলকলালে যে গণ্ডগোল হয় তা কোন শাস্ত্রে লেখা আছে শুনি ? এটা তোর মেয়েলি